জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) প্রণীত

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিকভাবে
মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়ন সহায়তায়

ভলান্টারি গাইডলাইন

VOTE
VOTE

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিকভাবে
মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে সহায়তায়

ভলান্টারি গাইডলাইন

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কাউন্সিলের ১২৭তম অধিবেশনে গৃহীত
নভেম্বর ২০০৪

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা
রোম, ২০০৫

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক প্রণীত

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিকভাবে মানুষের
পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে সহায়তায়
ভলান্টারি গাইডলাইন

বাংলা অনুবাদ মুদ্রণ ও প্রকাশ
বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক- খানি
www.khanibangladesh.net

বাংলা অনুবাদ প্রকাশকাল
জুলাই, ২০২৬

মুদ্রণ সহায়তা
ব্রেড ফর দ্যা ওয়ার্ল্ড

মূল ডকুমেন্ট লিংক
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/1898-ca74-1041-4741-a53a-295af3c09a17/content

ক্যাম্পইন বিষয়ে যোগাযোগ করুন-
পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান
বিশ্বাস কুঞ্জছায়া, বাড়ি ২২/২ (২য় তলা), খিলজি রোড়
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ইমেইল : contact@praan.org.bd
ওয়েবসাইট : www.praan.org.bd

ডিসক্লেইমার
এই বাংলা সংস্করণটি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কর্তৃক গৃহীত "Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security" এর একটি অনুবাদভিত্তিক প্রকাশনা। এর উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞান বিস্তার, শিক্ষা, গবেষণা, নীতি সংলাপ এবং সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করা। এই অনুবাদ কোনো আইন, বিধি, প্রবিধান বা বিচারিকভাবে বলবৎযোগ্য দলিল নয় এবং এটি মূল ইংরেজি পাঠের বিকল্প হিসেবে গণ্য হবে না। অনুবাদ ও মূল পাঠের মধ্যে কোনো অর্থগত পার্থক্য বা ব্যাখ্যাগত প্রশ্ন দেখা দিলে FAO কর্তৃক গৃহীত মূল ইংরেজি সংস্করণই প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রাককথন

নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা বিষয়টিকে পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন দৃঢ়তার সাথে। মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকারের সাথে এই অধিকারটি সম্পর্কিত। এটি ক্ষুধামুক্ত থাকার সর্বজনীন যে মানবাধিকার, তারও অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এর পাঁচ বছর পর সকল প্রকার মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মৌলিক স্বাধীনতার মর্যাদা জোরদার করার গুরুত্বের কথা পুনর্ব্যক্ত হয় ২০০২ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে। একই সঙ্গে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে সদস্য রাষ্ট্রসমূহতে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করার জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কাউন্সিলকে আহ্বান জানানো হয়, যাতে তারা কিছু ভলান্টারি গাইডলাইন বা স্বেচ্ছামূলক নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে পারে যা সদস্য রাষ্ট্রসমূহর জন্য সহায়ক হবে।

এই প্রেক্ষাপটে ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়। একইসাথে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনারের দপ্তর এবং খাদ্য অধিকার বিষয়ক বিশেষ র‌্যাপোর্টিয়ারের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতাকে আরও জোরদার করা হয়। আন্তঃরাষ্ট্রীয় ওয়ার্কিং গ্রুপ এর সদস্য, ব্যুরো, এবং বিভিন্ন অংশীজন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে নিবিড় ও গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী দুই বছর ধরে কাজ এগিয়ে চলে। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০০৪ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কাউন্সিল এই ভলান্টারি গাইডলাইনকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে।

এই ভলান্টারি গাইডলাইন বা স্বেচ্ছামূলক নির্দেশিকাটি বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত প্রথম এমন উদ্যোগ যা মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলোকে ব্যাখ্যা করে এবং এগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য কী কী করণীয় তার সুপারিশ করতে পারে। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যায়ক্রমে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কী কী করতে হবে তার বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনাই এর মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহকে দেয়া হয়েছে, যাতে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন করা যায়। একই সঙ্গে, সংশ্লিষ্ট অংশীজনরাও এই গাইডলাইন থেকে উপকৃত হতে পারে।

এই গাইডলাইনে জাতীয় পর্যায়ে সরকারের বিবেচনার জন্য সম্পূর্ণ কার্যপরিধি তুলে ধরা হয়েছে যাতে মানুষ মর্যাদার সঙ্গে নিজের খাদ্যের সংস্থান করতে পারে এমন ব্যবস্থা করা যায় এবং অন্যদিকে যারা তা করতে অক্ষম তাদের জন্য উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। বর্তমান উন্নয়ন কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে, বিশেষ করে সামাজিক ও মানবিক দিকগুলোকে অগ্রাধিকারে রেখে মানুষের অধিকার ও প্রাপ্যতাকে আরও দৃঢ়ভাবে উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত করতে এই গাইডলাইনটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই গাইডলাইনে খাদ্য ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সংস্থা, যেমন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কার্যক্রমে মানবাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘের সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মহাসচিবের আহ্বান অনুযায়ী, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মোকাবিলার জন্য এই গাইডলাইন একটি বাড়তি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে- যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহর সহায়তায় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা তাদের সক্ষমতাকে আরও জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে আগ্রহী রাষ্ট্রসমূহকে এই গাইডলাইন বাস্তবায়নে সহায়তা করা যায়।

যেসব রাষ্ট্র দারিদ্র্য হ্রাসে অধিকারভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণে আগ্রহী এবং জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেসব রাষ্ট্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের সহায়তায় খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কাজ করতে আগ্রহী। প্রতিটি মানুষের জন্য নিয়মিত পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা কেবল একটি নৈতিক দায়িত্ব বা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বিনিয়োগই নয়; বরং এটি একটি মৌলিক মানবাধিকারের বাস্তবায়ন।

জ্যাক দিওফ
মহাপরিচালক
জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)

সূচিপত্র

১ | মুখবন্ধ ও ভূমিকা

মুখবন্ধ ১

ভূমিকা

মৌলিক উপাদানসমূহ ৩

পর্যাপ্ত খাদ্য অধিকার এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ৫

২ | সহায়ক পরিবেশ, সহায়তা ও জবাবদিহিতা

গাইডলাইন-১: গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার এবং আইনের শাসন ৭

গাইডলাইন-২: অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিমালা ৭

গাইডলাইন-৩: কৌশলসমূহ ৯

গাইডলাইন-৪: বাজার ব্যবস্থা ১০

গাইডলাইন-৫: প্রতিষ্ঠান ১২

গাইডলাইন-৬: অংশীজন ১২

গাইডলাইন-৭: আইনি কাঠামো ১৩

গাইডলাইন-৮: সম্পদ ও পরিসম্পদের প্রাপ্তি ও ব্যবহারের সুযোগ ১৩

গাইডলাইন-৮ (ক): শ্রম ১৪

গাইডলাইন-৮ (খ): ভূমি ১৫

গাইডলাইন-৮ (গ): পানি ১৫

গাইডলাইন-৮ (ঘ): খাদ্য ও কৃষির জিনগত সম্পদ ১৬

গাইডলাইন-৮ (ঙ): স্থায়িত্বশীলতা ১৬

গাইডলাইন-৮ (চ): পরিষেবা ১৬

গাইডলাইন-৯: খাদ্য নিরাপদতা ও ভোক্তা অধিকার রক্ষা ১৭

গাইডলাইন-১০: পুষ্টি ১৮

গাইডলাইন-১১: শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি ২০

গাইডলাইন-১২: জাতীয় আর্থিক সম্পদ ২১

গাইডলাইন-১৩: পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা ২২

গাইডলাইন-১৪: নিরাপত্তা বেষ্টনী ২২

গাইডলাইন-১৫: আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তা ২৩

গাইডলাইন-১৬: প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ২৪

গাইডলাইন-১৭: তদারকি, নির্দেশক এবং মানদন্ড ২৬

গাইডলাইন-১৮: জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ২৭

গাইডলাইন-১৯: আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ২৭

৩ | আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, কার্যক্রম এবং অঙ্গীকারসমূহ
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং একপাক্ষিক ব্যবস্থা ২৮
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা ২৮
প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ২৯
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৯
বৈদেশিক ঋণ ৩০
আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা ৩০
আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তা ৩১
এনজিও/নাগরিক সংগঠন/বেসরকারি খাতের সঙ্গে অংশীদারিত্ব ৩১
পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষা ৩১
আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন ৩২

মুখবন্ধ

১. বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের লক্ষ্য নির্ধারণে ক্ষুধা নির্মূলের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে ২০১৫ সালের মধ্যে অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। একইভাবে, সহস্রাব্দ সম্মেলনেও ২০১৫ সালের মধ্যে ‘ক্ষুধায় ভোগা মানুষের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা’র কথা বলা হয়েছে।।

২. বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক রোম ঘোষণায় বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা প্রত্যেক মানুষের নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তির বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেছেন, যা পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার এবং প্রত্যেক মানুষের ক্ষুধামুক্ত থাকার মৌলিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য ৭.৪-এ বলা হয়েছে: “অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক দলিলে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, সেভাবে প্রত্যেক মানুষের যথাযথ খাদ্যের অধিকার ও ক্ষুধামুক্ত থাকার মৌলিক অধিকারকে স্পষ্ট করা, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে এই অধিকারগুলো বাস্তবায়ন ও পরিপূর্ণ করা এবং ধারাবাহিকভাবে তা অর্জন করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে”।

৩. কর্মপরিকল্পনায় চুক্তি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে এবং জাতিসংঘের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিশেষায়িত সংস্থা, কর্মসূচি ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহযোগিতার ভিত্তিতে চুক্তির ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত খাদ্য-সম্পর্কিত অধিকারগুলোকে আরও সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করার কথা বলা হয়। পাশাপাশি, এই অধিকারগুলোর বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার উপায় প্রস্তাবের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারকে আহ্বান জানানো হয়। একইসঙ্গে, সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভলান্টারি গাইডলাইন প্রণয়নের সম্ভাবনাটিকেও বিবেচনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৪. বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের এই আহ্বানের প্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরামর্শের পর, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক কমিটি সাধারণ মন্তব্য-১২ (General Comment 12) গ্রহণ করে, যেখানে বিশেষজ্ঞরা যথাযথ খাদ্যের অধিকারের ধারাবাহিক বাস্তবায়ন সম্পর্কে তাদের অভিমত প্রদান করেন।

৫. ২০০২ সালের বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন: “পাঁচ বছর পর” গৃহীত ঘোষণার ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধানগণ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কাউন্সিলকে তাদের ১২৩তম অধিবেশনে একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় ওয়ার্কিং গ্রুপ (IGWG) গঠনের আহ্বান জানান। “সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুই বছরের মধ্যে ভলান্টারি গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে, যা সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে তাদের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় সহায়তা করবে” — এটি এই ওয়ার্কিং গ্রুপের বাধ্যবাধকতা ছিল।

৬. এই গাইডলাইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিকভাবে মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রসমূহকে বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা, যাতে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। একইসঙ্গে, সংশ্লিষ্ট অংশীজনরাও এই নির্দেশনা থেকে উপকৃত হতে পারে।

৭. এই ভলান্টারি গাইডলাইন তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মূলনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন—সমতা ও বৈষম্যহীনতা, অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন, এবং সকল মানবাধিকারের সর্বজনীনতা, অবিভাজ্যতা, পরস্পরসম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। খাদ্যকে কখনোই রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

৮. আন্তঃরাষ্ট্রীয় ওয়ার্কিং গ্রুপ এই ভলান্টারি গাইডলাইন প্রণয়নে আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে সহায়তা পেয়েছে। এই গাইডলাইন বাস্তবায়ন মূলত রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু বৃহত্তর নাগরিক সমাজের সকল সদস্য, এনজিও এবং বেসরকারি খাতসহ সকলের অবদানের মাধ্যমে তা আরও কার্যকর হতে পারে।

৯. এই ভলান্টারি গাইডলাইনটি মানবাধিকারের ভিত্তিতে তৈরি করা একটি ব্যবহারিক উপকরণ, যা সকল রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু এগুলো রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক সংস্থার ওপর কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বিদ্যমান অধিকার ও দায়িত্ব সংশোধন, পরিবর্তন বা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে এই গাইডলাইনের কোনো বিধানকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। রাষ্ট্রসমূহকে তাদের কৌশল, নীতি, কর্মসূচি ও কার্যক্রম প্রণয়নে এই গাইডলাইন প্রয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং এটি করতে হবে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য কোনো অবস্থার ভিত্তিতে কোনো প্রকার বৈষম্য করা ছাড়াই।

ভূমিকা

মৌলিক উপাদানসমূহ

১০. খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য অধিকার অর্জনের পথে এই গাইডলাইন প্রণয়নে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দলিলসমূহকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, বিশেষত সেইসব দলিল যেখানে পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার অধিকার তথা পর্যাপ্ত খাদ্যের বিষয়টি সংরক্ষিত আছে। যেমন:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র, অনুচ্ছেদ ২৫ (১)
১.খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সমাজকল্যাণমূলক কার্যাদির সুযোগ এবং সেই সাথে অসুখ, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা জীবনযাপনে অনিবার্যকারণে সংঘটিত অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং বেকার হলে নিরাপত্তার অধিকারসহ নিজের এবং নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, অনুচ্ছেদ ১১
১১.১ বর্তমান চুক্তির রাষ্ট্রপক্ষসমূহ স্বীকার করে যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের এবং নিজ পরিবারের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানসহ জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত মান অর্জন এবং জীবনযাত্রা নিরবচ্ছিন্নভাবে উন্নত করার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষসমূহ এই উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অপরিহার্য গুরুত্ব স্বীকারপূর্বক এই অধিকার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১১.২ প্রত্যেকের ক্ষুধামুক্ত থাকার মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে বর্তমান চুক্তির রাষ্ট্রপক্ষসমূহ এককভাবে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কর্মসূচিসহ এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যেগুলো নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে প্রয়োজন:

ক. কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টিনীতি সম্পর্কিত জ্ঞানের বিস্তারের দ্বারা এবং যাতে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সর্বাধিক উন্নয়ন ও ব্যবহার অর্জন করা যায় তেমনভাবে কৃষি-ভূমি ব্যবস্থার উন্নয়ন অথবা সংস্কার সাধনের দ্বারা খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বণ্টন পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন করা;

খ. খাদ্য আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক দেশ উভয়েরই সমস্যাদি

বিবেচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বে সুষ্ঠু খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত চুক্তি (ICESCR), অনুচ্ছেদ ২:

২.১. বর্তমান চুক্তির প্রত্যেক পক্ষ এককভাবে এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতা, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে লভ্য সম্পদ সর্বাধিক ব্যবহার করে সকল প্রকার উপযুক্ত উপায়ে এবং বিশেষভাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে, বর্তমান চুক্তিতে স্বীকৃত অধিকারসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

২.২ বর্তমান চুক্তির রাষ্ট্রপক্ষসমূহ এরকম অংগীকার করে যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, নারী-পুরুষ, রাজনৈতিক বা অন্য মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম অথবা অন্য কোন মর্যাদার ভিত্তিতে কোনরূপ বৈষম্য না করে চুক্তিতে বর্ণিত অধিকারসমূহ ভোগের নিশ্চয়তা দান করবে।

১১. খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য অধিকার অর্জনের পথে জাতিসংঘ ঘোষণার ধারাসমূহের মধ্যে ৫৫ ও ৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদ এই নির্দেশিকার সাথে বিশেষভাবে সংগতিপূর্ণ।

জাতিসংঘ সনদ, অনুচ্ছেদ-৫৫

সম-অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি সৃষ্টির ক্ষেত্রে জাতিসংঘের দায়িত্ব হচ্ছে:

ক. জীবনযাত্রার উচ্চতর মান অর্জন, পূর্ণ কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া;

খ. আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাদির সমাধান এবং সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা; এবং

গ. জাতিগোষ্ঠী, নারী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম-নির্বিশেষে সবার জন্য মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারসমূহ সংরক্ষণ ও সর্বজনীন মর্যাদা অর্জন করা।

জাতিসংঘ সনদ, অনুচ্ছেদ-৫৬

ধারা ৫৫-এ বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলি কায়েম করার জন্য সব সদস্যরাষ্ট্র একক ও যৌথভাবে জাতিসংঘের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

১২. অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিল বা চুক্তি, যেমন শিশু অধিকার সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, চারটি জেনেভা কনভেনশন ও এর অতিরিক্ত প্রোটকলসমূহের মধ্যেও এই ভলান্টারি গাইডলাইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন ধারা রয়েছে।

১৩. এই নির্দেশিকায় সহস্রাব্দ ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিশ্রুতিগুলো, বিশেষত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ, এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জাতিসংঘের প্রধান সম্মেলন ও শীর্ষ বৈঠকগুলোর ফলাফল ও অঙ্গীকারসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

১৪. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কয়েকটি রেজুলেশন, মানবাধিকার কমিশন এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক কমিটি কর্তৃক গৃহীত সাধারণ মন্তব্যসমূহও আন্তঃরাষ্ট্রীয় ওয়ার্কিং গ্রুপ বিবেচনায় নিয়েছে।

পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন

১৫. খাদ্য নিরাপত্তা তখনই নিশ্চিত হয়, যখন সকল মানুষের জন্য একই সময়ে পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়ার সরাসরি ও অর্থনৈতিক সুযোগ বিদ্যমান থাকে। এই খাদ্য তাদের পছন্দসই খাদ্যাভ্যাসের চাহিদা পূরণ করে এবং একটি সক্রিয় ও সুস্থ জীবনযাপন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। খাদ্য নিরাপত্তার চারটি মূল স্তম্ভ হলো: খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য সরবরাহের স্থিতিশীলতা, খাদ্যের সহজলভ্যতা এবং খাদ্য পরিপুষ্টির স্থিতিশীলতা।

১৬.ধারাবাহিকভাবে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে জন্য রাষ্ট্রসমূহকে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে প্রাসঙ্গিক সকল মানবাধিকার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাসমূহ পূরণ করতে হবে। এই ভলান্টারি গাইডলাইনের লক্ষ্য হলো—সকলের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, যা পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকে খাদ্যাভ্যাসের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট; এবং বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীসহ সকল মানুষের জন্য নিরাপদ, সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং সহজলভ্য (ভৌত ও অর্থনৈতিকভাবে) খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য খাদ্য অথবা তা সংগ্রহের উপায় নিশ্চিত করা।

১৭. প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিশেষত, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের মাধ্যমে এই অধিকারকে সম্মান, সুরক্ষা, উন্নয়ন (প্রচার) এবং বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। রাষ্ট্রসমূহকে পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়ার বিদ্যমান অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে—অর্থাৎ এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না যা এই খাদ্য পাওয়ার অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করে। একই সঙ্গে, রাষ্ট্রকে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খাদ্য পাওয়ার অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করতে না পারে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উচিত এমন নীতি প্রণয়ন করা যা জনগণের পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকারের ধারাবাহিক বাস্তবায়নে অবদান রাখে; এবং এর জন্য সক্রিয়ভাবে এমন কার্যক্রম নিতে হবে যা সম্পদ ও উপকরণের প্রাপ্তি ও ব্যবহারকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে জনগণের জীবিকা নির্বাহকে নিশ্চিত করবে, যার মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও রয়েছে। এছাড়া, রাষ্ট্র তার সম্পদের সীমার মধ্যে এমন একটি সুরক্ষা বলয় বা সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে ও বজায় রাখবে, যা নিজের জন্য খাদ্যের

ব্যবস্থা করতে অক্ষম ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

১৮. যেসব রাষ্ট্র এখনো অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষর করেনি তাদের এই চুক্তিতে অনুসমর্থন (ratification) করার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

১৯. জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়াস মানবাধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি: সর্বজনীনতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, অবিভাজ্যতা ও আন্তঃসম্পর্কিত মানবাধিকারসমূহের উপর গুরুত্বারোপ করে; পাশাপাশি রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকার বাধ্যবাধকতার উপরেও জোর দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিদ্যমান অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের ফলাফল হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতির ওপর জোর দেওয়া হয়: জনসংশ্লিষ্ট বিষয় পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্য অনুসন্ধান, গ্রহণ ও প্রচারের অধিকার। এই পদ্ধতিতে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া থেকে প্রায়শই বাদ পড়েন এমন দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে, বৈষম্যমুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়, যেখানে রাষ্ট্র তার মানবাধিকার সংক্রান্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। এই প্রক্রিয়ায় জনগণ কেবল সহায়তা গ্রহণকারী নয়, বরং তারা নিজেদের সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখে এবং মানব উন্নয়নের প্রক্রিয়ার সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মানবাধিকারভিত্তিক এই প্রয়াস চূড়ান্ত অর্থে শুধু ক্ষুধা দূর করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সেই লক্ষ্য অর্জনের উপায় ও কৌশল নির্ধারণের ওপরও এটি জোর দেয়। মানবাধিকারের মূলনীতিসমূহের প্রয়োগ এই পুরো প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

গাইডলাইন | ১
গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার এবং আইনের শাসন

১.১ একটি শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল ও সহায়ক অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রসমূহকে একটি মুক্ত, গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন এবং তার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে যেখানে একজন ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদার সঙ্গে নিজের ও তার পরিবারের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে পারে।

১.২ গণতন্ত্র, আইনের শাসন, টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন উন্নীতকরণ এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহকে উন্নীত ও সুরক্ষায় রাষ্ট্রকে কাজ করতে হবে, যাতে ব্যক্তি ও নাগরিক সমাজ সরকারের কাছে তাদের বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করতে পারে, নিজেদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী নীতি প্রণয়নে অংশ নিতে পারে এবং যাতে এসব নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যেতে পারে। রাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্যের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে, যা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে ক্রমান্বয়ে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখবে। খাদ্যকে কখনোই রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

১.৩ রাষ্ট্রসমূহ অপরিহার্য উপাদান হিসেবে সুশাসন নিশ্চিত করবে, যা টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ এবং সকল মানবাধিকারের বাস্তবায়ন, বিশেষ করে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের আবশ্যকীয় শর্ত।

১.৪ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী সকল ব্যক্তি, বিশেষ করে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে নিয়োজিত মানবাধিকার কর্মীসহ প্রত্যেকেই আইনের অধীনে সমান সুরক্ষা পাবে এবং সকল সকল আইনি কার্যধারায় যথাযথ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

১.৫ রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উচিত পর্যাপ্ত খাদ্য অধিকার বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা পেতে যেকোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সর্বতোভাবে সহায়তা করা।

গাইডলাইন | ২
অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিমালা

২.১ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিকভাবে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রসমূহের নিজ খাদ্য নিরাপত্তা নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃহত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে হবে। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা চাহিদার ভিত্তিতে নীতিগত লক্ষ্য ও মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে।

২.২ প্রধান অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শেরভিত্তিতে রাষ্ট্র তার নিজ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে, যার মধ্যে খাদ্য অনিশ্চয়তার মাত্রা ও তার কারণসমূহ, পুষ্টি পরিস্থিতি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২.৩ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, বাণিজ্য, সংরক্ষণ এবং বিতরণের সমন্বয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে নিরাপদ খাদ্যের পর্যাপ্ত ও স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

২.৪ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য একটি সমন্বিত ও সর্বব্যাপী পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়টি প্রতিটি রাষ্ট্রেরই বিবেচনা করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাৎক্ষণিক ও সরাসরি ব্যবস্থা, দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষের জীবিকা টেকসইভাবে উন্নয়নের জন্য উৎপাদনশীল কার্যক্রম ও প্রকল্পে বিনিয়োগ, উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান, কার্যকর বাজার এবং সহায়ক আইনগত ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো গড়ে তোলা, কর্মসংস্থান, উৎপাদনশীল সম্পদ এবং উপযুক্ত সেবায় পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়গুলো এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

২.৫ রাষ্ট্রসমূহকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, বৈষম্যহীন ও সুষ্ঠু অর্থনৈতিক, কৃষি, মৎস্য, বনায়ন, ভূমি ব্যবহার এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি সংস্কার নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। এসব নীতিমালা কৃষক, জেলে, বনজীবী এবং অন্যান্য খাদ্য উৎপাদকদের, বিশেষ করে নারীদের, তাদের শ্রম, পুঁজি ও ব্যবস্থাপনার জন্য ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে এবং বিশেষত প্রান্তিক এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করবে।

২.৬ যেসব গ্রামীণ অঞ্চলে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা প্রকট, সেখানে টেকসই কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে রাষ্ট্রকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর অংশ হিসেবে ভূমি, পানি, উপযুক্ত ও সাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং উৎপাদনশীল ও আর্থিক সম্পদ পাওয়ার অধিকারকে উন্নত করতে হবে; দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে; অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে; উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল ন্যায্যভাবে বণ্টন করতে হবে; প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে; এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে শিক্ষা ও গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় স্থিতিশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে রাষ্ট্রকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্যে কৃষির বাইরেও কাজের সুযোগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২.৭ নগর অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসমূহকে শহুরে দরিদ্রদের জীবিকা উন্নয়নে সহায়ক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে।

গাইডলাইন | ৩
কৌশলসমূহ

৩.১ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শক্রমে এবং নিজস্ব জাতীয় আইনের আলোকে, রাষ্ট্র জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিকভাবে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য একটি মানবাধিকারভিত্তিক জাতীয় কৌশল গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। এটি একটি সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের অংশ হওয়া উচিত, যার মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলও (সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যদি থাকে) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩.২ বিদ্যমান জাতীয় আইন, নীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার যথাযত মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে চলমান কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা; বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাসমূহের পদ্ধতিগত সনাক্তকরণ; এবং বিদ্যমান সম্পদের প্রাপ্যতা নিরূপণের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে এই কৌশল প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ সংক্রান্ত নীতিমালার বিদ্যমান যে কোনো সীমাবদ্ধতা দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নির্ধারণ করতে হবে এবং পরিবর্তনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের উপায় প্রস্তাব করতে হবে।

৩.৩ এই কৌশলসমূহের মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে তার মধ্যে রয়েছে- লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মানদণ্ড , সময়সীমা এবং বিভিন্ন কার্যক্রম নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন, সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও তার ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ধারণ, দায়িত্ব বণ্টন, বিভিন্ন অংশীজনের কার্যক্রম সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধান পদ্ধতি নির্ধারণ। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এই কৌশলসমূহে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ, বিপণন বাজার ব্যবস্থা, ভোগসহ খাদ্য ব্যবস্থার সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। পাশাপাশি সম্পদ ও বাজারে প্রবেশাধিকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খাতে সমন্বিত পদক্ষেপগুলোও এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিশেষভাবে, এসব কৌশলে ঝুঁকিপূর্ণ ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জরুরি পরিস্থিতির মতো বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় নিতে হবে।

৩.৪ প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহর উচিত জাতীয় দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল গ্রহণ করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূর্বপর্যালোচনা করা, যা বিশেষভাবে পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৩.৫ দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনভাবে অথবা সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায়, বৈষম্যহীনতার নীতির ভিত্তিতে মানবাধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। একই সঙ্গে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগতভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বাস্তব সমতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা জরুরি।

৩.৬ দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহকে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক

সেবা প্রদানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে। এর মধ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ, মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিরাপদ পানীয় জল, পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। একই সঙ্গে মৌলিক সাক্ষরতা, সংখ্যাজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যসম্মত জ্ঞান বিষয়ক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে সহায়তা করতে হবে।

৩.৭ পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে রাষ্ট্রসমূহকে কৃষি খাতকে পুনুরুজ্জীবিত করা এবং টেকসই উপায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রথাগত কৃষক ও মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ নীতি ও কৌশল গ্রহণ করতে হবে এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কৃষি উৎপাদন, বিপণন ও বিতরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করার ওপর জোর দিতে হবে।

৩.৮ এই কৌশলগুলো প্রণয়নের সময় জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নাগরিক সমাজ সংগঠন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সঙ্গে রাষ্ট্রের পরামর্শ করা প্রয়োজন। এর মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রথাগত কৃষক, বেসরকারি খাত, নারী ও যুব সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যাতে তারা কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৩.৯ এই কৌশলসমূহ স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমন্বিত হতে হবে এবং জাতীয় নীতি, কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত হতে হবে। পাশাপাশি নারী ও কন্যাশিশুর বিশেষ চাহিদা যথাযথভাবে বিবেচনায় নিতে হবে এবং স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, এই কৌশলসমূহ যাতে অংশগ্রহণমূলক ও জবাবদিহিতামূলক পদ্ধতিতে প্রনীত ও বাস্তবায়িত হয় সেদিকেও রাষ্ট্রের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

৩.১০ জাতীয় উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আঞ্চলিক সহযোগিতা গ্রহণের বিষয়টিও রাষ্ট্রকে বিবেচনা করতে হবে। বিশেষ করে প্রতিটি রাষ্ট্রকেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস এবং ক্রমান্বয়ে মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

গাইডলাইন | ৪
বাজার ব্যবস্থা

৪.১ জাতীয় আইন ও অগ্রাধিকারসমূহ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিশ্রুতি বিবেচনায় রেখে প্রতিটি রাষ্ট্রের উচিত টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাজারব্যবস্থা, বিশেষ করে কৃষি ও খাদ্যবাজার ক্রিয়াশীল রাখা। উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি, যথাযথ ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন, মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪.২ বাজারে বৈষম্যহীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে এবং একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিরোধে রাষ্ট্রকে কার্যকর আইন, নীতি, পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

৪.৩ ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতার বিকাশ এবং সকল বাজার অংশগ্রহণকারী ও নাগরিক সমাজকে প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করতে হবে, যাতে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়িত হয়।

৪.৪ প্রতারণামূলক বাজার কার্যকলাপ, ভুল তথ্য এবং অনিরাপদ খাদ্য থেকে ভোক্তাদের যথাযথ সুরক্ষা প্রদানে রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে এই লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ যেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিপন্থী না হয় এবং এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৫ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহ ক্ষুদ্র পরিসরের স্থানীয় ও আঞ্চলিক বাজার এবং সীমান্ত বাণিজ্যের বিকাশকে উৎসাহিত করবে, যাতে করে গ্রাম ও শহরের দারিদ্র্য হ্রাস পায় এবং খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়।

৪.৬ রাষ্ট্র চাইলে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে যার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মানুষ, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী প্রতিযোগিতামূলক কৃষি বাণিজ্য ব্যবস্থার সুফল ভোগ করতে পারে।

৪.৭ খাদ্য, কৃষি বাণিজ্য এবং সামগ্রিক বাণিজ্য নীতিমালা যেন সকলের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। বৈষম্যহীন ও বাজারমুখী স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা করা সম্ভব।

৪.৮ কার্যকর অভ্যন্তরীণ বিপণন, সংরক্ষণ, পরিবহন, যোগাযোগ ও বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকবে, যাতে বহুমুখী বাণিজ্য সহজতর হয় এবং অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাজারের সার্বিক বা দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়, পাশাপাশি নতুন বাজারের সুযোগ কাজে লাগানো যায়।

৪.৯ রাষ্ট্রকে এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিতে হবে যে, বাজারব্যবস্থা সবসময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সবার জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণের মতো পর্যাপ্ত আয় নিশ্চিত করতে পারে না। তাই একটি কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। একই সঙ্গে, প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তা গ্রহণ করাও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৪.১০ পরিবেশ ও জনসম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলোও রাষ্ট্রকে বিবেচনায় নিতে হবে।

গাইডলাইন | ৫
প্রতিষ্ঠান

৫.১ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উচিত সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনে এ ধরণের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি কিংবা পুনর্গঠন করা অথবা সংগঠন ও কাঠামো উন্নয়ন করা।

৫.২ এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহ সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও দপ্তরগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করতে পারে। এছাড়া জাতীয় আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যাতে নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিসমূহের সমন্বিত বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত হয়। এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের সব পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৩ ১৯৯৩ সালের ভিয়েনা মানবাধিকার কনভেনশনে গৃহীত ‘ডিক্লারেশন অ্যান্ড প্রোগ্রাম অব অ্যাকশান’ বিবেচনায় রেখে এবং বিদ্যমান কৃষি সংক্রান্ত চুক্তি ও প্রোটোকলসমূহের উপর গুরুত্বারোপ করে রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এই নির্দেশিকাগুলোর প্রয়োগ তদারকি ও সমন্বয়ের সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কার্যাবলি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে, নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে এবং পর্যাপ্ত তদারকির ব্যবস্থা রাখাটাও জরুরি।

৫.৪ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেসরকারি ও নাগরিক সমাজের স্বচ্ছ ও সর্বাত্মক অংশগ্রহণ, বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৫ রাষ্ট্র তার প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যকর দুর্নীতিবিরোধী আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, জোরদার, বাস্তবায়ন ও বজায় রাখার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে—যার মধ্যে খাদ্য খাত এবং জরুরি খাদ্য সহায়তার ব্যবস্থাপনাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

গাইডলাইন | ৬
অংশীজন

৬.১ পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব স্বীকার করে, রাষ্ট্রের উচিত জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বহু অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতি চালু করা। এর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজ, বেসরকারি খাতসহ সকল অংশীজনের ভূমিকা নির্ধারণ এবং সম্পৃক্ততা নিরূপণ করা সম্ভব হবে—যার ফলে সকলের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে।

গাইডলাইন | ৭
আইনি কাঠামো

৭.১ জাতীয় আইনগত ও নীতিগত কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, প্রয়োজনে বিদ্যমান আইনে নতুন ধারা সংযোজন বা সংবিধানিক ও আইনগত পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা সেটি বিবেচনা করতে রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে, যাতে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায়।

৭.২ জাতীয় আইন ও নীতিমালা কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্র প্রয়োজনে বিদ্যমান আইনে নতুন ধারা সংযোজনের মাধ্যমে সংবিধান, নাগরিক অধিকার বা আইনের সংশোধন করতে পারে, যা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার আলোকে পর্যাপ্ত খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে, ঝুঁকিপূর্ণ বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য বিশেষভাবে সহজপ্রাপ্য এমন প্রশাসনিক, অর্ধ-বিচারিক (কোয়াজি-জুডিশিয়াল) এবং বিচারিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও দ্রুত প্রতিকার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৭.৩ যেসব রাষ্ট্র পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার নিশ্চিতকরণে আইনগত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদের উচিত এই আইনের আওতায় প্রাপ্য সকল অধিকার ও প্রতিকারের বিষয়ে সাধারণ জনগণকে অবহিত করা।

৭.৪ নারীপ্রধান পরিবারগুলোর দারিদ্র্য হ্রাস এবং তাদেরকে পুষ্টি নিরাপত্তা কর্মসূচি ও প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রসমূহকে তাদের অভ্যন্তরীণ আইন ও নীতিমালা শক্তিশালী করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

গাইডলাইন | ৮
সম্পদ ও পরিসম্পদের প্রাপ্তি ও ব্যবহারের সুযোগ

৮.১ দেশের বিদ্যমান আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতি রেখে রাষ্ট্রের উচিত সম্পদ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থায়িত্বশীল, বৈষম্যহীন ও নিরাপদ অভিগম্যতা সৃষ্টি করা। জনগণের জীবিকা নির্বাহের জন্য অপরিহার্য সম্পদ সুরক্ষায় রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হতে হবে। ভূমি, পানি, বনাঞ্চল, মৎস্যসম্পদ ও প্রাণিসম্পদসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া ও তা ব্যবহারে সাধারণ মানুষের যে অধিকার রয়েছে রাষ্ট্রের উচিত সর্বদাই তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং তা সংরক্ষণের চেষ্টা করা। এ কাজে কোন ধরনের বৈষম্য করা যাবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্র মানবাধিকারের প্রতি বাধ্যবাধকতা ও আইনের শাসনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভূমি সংস্কার বা অন্যান্য নীতিমালা সংস্কারের মাধ্যমে দক্ষতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের ভূমি ব্যবহারের অধিকার নিশ্চিত করতে পারে এবং দারিদ্র্যবান্ধব প্রবৃদ্ধি জোরদার করতে পারে। গ্রামীণ জনপদ, আদিবাসী ইত্যাদি শ্রেণীর জনপদের

মানুষের এবং তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে সম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে তাদের জন্য বিশেষ নজর দেওয়া যেতে পারে।

৮.২ সুবিধাবঞ্চিত বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মানুষ যাতে অর্থনৈতিক সুযোগ ও সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার পায় এবং অর্থনীতিতে পূর্ণ ও সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে রাষ্ট্রকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮.৩ নারী, পিছিয়েপড়া, প্রান্তিক ও ঐতিহ্যগতভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মানুষের পাশাপাশি এইচআইভি বা এইডস আক্রান্ত মানুষেরা যাতে সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করার দিকে রাষ্ট্রের বিশেষ নজর দেয়া উচিত। জাতীয় সম্পদ ও পরিসম্পদ ব্যবহার থেকে যেন এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত মানুষেরা বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

৮.৪ কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড বৃদ্ধিতে রাষ্ট্র উৎসাহ দিতে হবে। বিশেষ করে মৌলিক খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মৌলিক আয় বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে, যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক ও নারী কৃষকের উন্নয়ন এবং দরিদ্র ভোক্তাদের জন্য ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করা সম্ভব।

৮.৫ প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিশেষ করে মেধাস্বত্বসংক্রান্ত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রের উচিত এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকরা বিভিন্ন গবেষণার সুফল সহজে পেতে পারে; যা তাদের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

৮.৬ রাষ্ট্রের উচিত অর্থনীতিতে নারীদের পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে লিঙ্গীয় পরিচয়ের প্রতি সংবেদনশীল আইন প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীদের ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ও মালিকানার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে, ঋণ, ভূমি, পানি ও উপযুক্ত প্রযুক্তিসহ উৎপাদনশীল সম্পদের ওপর নারীদের নিরাপদ ও সমান অধিকার, নিয়ন্ত্রণ এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত সুবিধা নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

৮.৭ রাষ্ট্রসমূহকে এমন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কৃষিজমি প্রাপ্তি ও তার যথাযথ ব্যবহারের বিভিন্ন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

গাইডলাইন | ৮ (ক)
শ্রম

৮.৮ টেকসই উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানে রাষ্ট্রকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে, শোভন পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা যায় এমন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, যার মাধ্যমে গ্রামীণ ও নগর জনপদের পরিবারগুলো পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে এবং

আত্মকর্মসংস্থানকে উৎসাহ প্রদান করবে ও সুরক্ষা দেবে। যেসব রাষ্ট্র ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন করেছে তাদের উচিত কর্মক্ষেত্রে এমন কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার এবং আইএলও কনভেনশনের সংশিষ্ট ধারা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি বিশেষ করে মানবাধিকার সংক্রান্তকনভেনশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

৮.৯ শ্রমবাজারে প্রবেশাধিকার উন্নত করার জন্য রাষ্ট্রসমূহকে শিক্ষা কর্মসূচি, প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন করতে হবে, যাতে বর্ণ, গায়ের রং, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য কোনো অবস্থার ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য না থাকে।

গাইডলাইন |৮ (খ)
ভূমি

৮.১০ রাষ্ট্রসমূহকে ভূমির মালিকানা নিরাপত্তা উন্নীত ও সুরক্ষিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, বিশেষ করে নারী এবং সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। এর জন্য এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যা ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তির পূর্ণ ও সমান মালিকানা এবং উত্তরাধিকার অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়।

প্রয়োজন অনুযায়ী, রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের দায়বদ্ধতা এবং আইনের শাসনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভূমি সংস্কার অগ্রসর করার জন্য আইনগত ও নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, যাতে দরিদ্র ও নারীদের ভূমি পাওয়ার অধিকার বৃদ্ধি পায়। এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমির সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারও নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিশেষ পরিস্থিতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

গাইডলাইন |৮ (গ)
পানি

৮.১১ জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ও মানসম্মত পানি প্রাপ্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্রসমূহকে পানি সম্পদে প্রবেশাধিকার উন্নত করা এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে ন্যায্য ও কার্যকর বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ হয় এবং একই সঙ্গে বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতা সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে গৃহস্থালি, শিল্প ও কৃষি চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়—এবং নিরাপদ পানীয় জলের মান বজায় থাকে।

গাইডলাইন | ৮ (ঘ)
খাদ্য ও কৃষির জিনগত সম্পদ

৮.১২ জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে এবং প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে দায়বদ্ধতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, রাষ্ট্রসমূহ খাদ্য ও কৃষির জন্য জেনেটিক সম্পদের ক্ষয় রোধ, সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট জাতীয় নীতি, আইনগত কাঠামো এবং সহায়ক ব্যবস্থাগুলো বিবেচনা করবে।

প্রাসঙ্গিক ঐতিহ্যগত জ্ঞান সুরক্ষা, এইসকল সম্পদের ব্যবহারের ফলে অর্জিত সুবিধার ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী, বিশেষ করে খাদ্য ও কৃষির জন্য জেনেটিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের বিষয়ে জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও কৃষকদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার বিষয়গুলো এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

গাইডলাইন | ৮ (ঙ)
স্থায়িত্বশীলতা

৮.১৩ রাষ্ট্রসমূহকে পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা এবং বাস্তুতন্ত্রের ধারণক্ষমতা রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট জাতীয় নীতি, আইনগত উপকরণ এবং সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টেকসই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়। এর মধ্যে পানি দূষণ প্রতিরোধ, মাটির উর্বরতা রক্ষা এবং মৎস্য ও বনসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা উন্নীতকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

গাইডলাইন | ৮ (চ)
পরিষেবা

৮.১৪ রাষ্ট্রসমূহকে এমন একটি সহায়ক পরিবেশ ও কৌশল তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে বেসরকারি ও সরকারি খাতের উদ্যোগগুলোকে উৎসাহিত ও সহায়তা করা যায়, যাতে উপযুক্ত সরঞ্জাম, প্রযুক্তি ও যান্ত্রিকীকরণ ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক সেবাসমূহ প্রদান করা যায়।

এই সেবাগুলোর মধ্যে গবেষণা, সম্প্রসারণ, বিপণন, গ্রামীণ অর্থায়ন এবং ক্ষুদ্রঋণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যা সকল কৃষকের, বিশেষ করে দরিদ্র কৃষকদের খাদ্য উৎপাদনকে আরও কার্যকর করতে সহায়তা করবে এবং ভূমি, পানি ও কৃষিশক্তির স্বল্পতার মতো স্থানীয় সীমাবদ্ধতাগুলো মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে।

গাইডলাইন | ৯
খাদ্য নিরাপদতা ও ভোক্তা অধিকার রক্ষা

৯.১ রাষ্ট্রের উচিত এমন সব কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে দেশে উৎপাদিত বা বিদেশ থেকে আমদানিকৃত, বাজারে কেনা বা বিনামূল্যে পাওয়া সব খাবারই নিরাপদ হয় এবং দেশের নির্ধারিত গুণগত মান বজায় রাখে।

৯.২ খাবার থেকে ছড়ানো রোগের ঝুঁকি কমাতে রাষ্ট্রকে একটি সুপরিকল্পিত ও আধুনিক তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। পশুপাখির খাবার থেকে শুরু করে মানুষের পাতে আসা পর্যন্ত পুরো খাদ্যচক্রের প্রতিটি ধাপে যেন খাবারের নিরাপত্তা বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নজরদারি চালাতে হবে।

৯.৩ খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজকে আরও সহজ ও সমন্বিত করতে হবে যাতে নিয়মনীতির মধ্যে কোনো ফাঁকফোকর বা একই কাজের পুনরাবৃত্তি না থাকে। খাবারে মেশানো ক্ষতিকর উপাদান, ভেজাল, ওষুধের অবশিষ্টাংশ, কীটনাশক এবং জীবাণুর ঝুঁকি রোধে রাষ্ট্রকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত মানদণ্ড ঠিক করতে হবে। পাশাপাশি খাবারের প্যাকেটজাতকরণ, লেবেল লাগানো এবং বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা প্রয়োজন। এই নিয়মগুলো তৈরির সময় ডব্লিউটিও স্যানিটারি অ্যান্ড ফাইটোস্যানিটারি এগ্রিমেন্ট (এসপিএস) অনুযায়ী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত খাদ্যমান (কোডেক্স এলিমেন্টেরিয়াস) বিবেচনায় নিতে হবে। খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন, বিতরণ, নাড়াচাড়া এবং বিক্রির সময় শিল্পজাত ও অন্যান্য দূষক থেকে যেন দূষণ না ঘটে, রাষ্ট্রকে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯.৪ খাদ্য ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সরকারি ও বেসরকারি সব পক্ষকে এক সুতোয় গাঁথতে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে রাষ্ট্র একটি 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠন করতে পারে। খাদ্য ব্যবসার সাথে জড়িত বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মান নিয়ন্ত্রণে যেমন সহায়তা করতে হবে, তেমনি তারা সঠিক নিয়ম মেনে খাবার তৈরি ও সরবরাহ করছে কি না, রাষ্ট্রকে তাও নিয়মিত যাচাই করে দেখতে হবে।

৯.৫ রাষ্ট্র প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষকদের উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করতে সহায়তা করবে। একইভাবে যারা খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করেন তাদের সঠিক উৎপাদন পদ্ধতি এবং যারা খাবার পরিবেশন বা প্রক্রিয়াকরণের সাথে যুক্ত, তাদের স্বাস্থ্যকর অভ্যাস মেনে চলতে সাহায্য করবে। ভোক্তাদের কাছে নিরাপদ খাবার পৌঁছে দিতে রাষ্ট্রকে একটি কার্যকর খাদ্য নিরাপত্তা ও তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৯.৬ খাদ্য ব্যবসার সাথে যারা জড়িত, তারা যেন নিরাপদ পদ্ধতিগুলো শিখতে পারেন রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে খাবারে কোনো ক্ষতিকর উপাদানের অবশিষ্টাংশ থাকবে না এবং পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না। এছাড়া বাড়িতে খাবার কীভাবে নিরাপদ উপায়ে

সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে হয়, সে বিষয়েও রাষ্ট্র সাধারণ মানুষকে সচেতন করবে। খাবার থেকে ছড়ানো রোগ এবং খাদ্য নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে তা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ কাজে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথেও রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করতে হবে।

৯.৭ খাবারের প্যাকেট, লেবেল, বিজ্ঞাপন বা বিক্রির সময় যেন কোনো ভুল তথ্য বা প্রতারণার মাধ্যমে ভোক্তাদের ঠকানো না হয়, রাষ্ট্রকে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। বাজারে থাকা খাবার সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিয়ে ভোক্তাদের নিজেদের পছন্দের খাবার বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। অনিরাপদ বা ভেজাল খাবারের কারণে (এমনকি রাস্তার ধারের খাবারের ক্ষেত্রেও) যদি কারো ক্ষতি হয়, তবে তার উপযুক্ত প্রতিকার বা বিচার পাওয়ার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করতে হবে। তবে এই নিয়মগুলো যেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোনো অযৌক্তিক বাধা তৈরি না করে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৯.৮ উন্নত দেশগুলোকে অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে খাদ্য নিরাপদতার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, ঋণ বা অনুদান দিয়ে দক্ষ করে তোলে এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। সম্ভব হলে যেসব উন্নয়নশীল দেশ খাদ্য নিরাপত্তায় কিছুটা এগিয়ে আছে, তারা যেন এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

৯.৯ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে সব পক্ষের সাথে (আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভোক্তা সংগঠনসহ) সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিতরণ, সংরক্ষণ এবং বিপণন সংক্রান্ত নীতিগুলো নিয়ে যখন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বড় কোনো আলোচনা বা সভা হবে, তখন যেন সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

গাইডলাইন | ১০
পুষ্টি

১০.১ প্রয়োজন হলে, রাষ্ট্রসমূহর উচিত খাদ্যের বৈচিত্র্য, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, খাবার তৈরির পদ্ধতি এবং সেইসাথে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোসহ পুষ্টি গ্রহণের ধরনগুলো সংরক্ষিত রাখার, মানিয়ে নেওয়ার বা শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নেওয়া; পাশাপাশি খাবারের সরবরাহ ও প্রাপ্তির পরিবর্তনগুলো খাদ্যের উপাদান ও পুষ্টি গ্রহণের ওপর যাতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।

১০.২ রাষ্ট্রসমূহকে বিশেষ করে শিক্ষা, তথ্য প্রদান এবং লেবেলিং বিধিমালার মাধ্যমে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ এবং ভারসাম্যহীন খাদ্যাভ্যাস রোধে পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যা

অপুষ্টি, স্থূলতা এবং শরীরের ক্ষয়জনিত রোগের কারণ হতে পারে।

১০.৩ স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার, বিশেষ করে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ খাবারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, তদারকি এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে, বিশেষ করে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করতে রাষ্ট্রসমূহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট এর ঘাটতি মেটাতে এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে রাষ্ট্রসমূহ বসতবাড়ি ও বিদ্যালয়ে বাগান করাকে একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে উৎসাহিত করতে পারে। রাষ্ট্রসমূহের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি, বিশেষ করে আয়োডিন, আয়রন এবং ভিটামিন এ-এর অভাব দূর করতে ও খাবারে পুষ্টিমান বাড়ানোর নিয়মনীতি গ্রহণের বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারে।

১০.৪ যারা এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত বা অন্যান্য মহামারীতে ভুগছেন, রাষ্ট্রসমূহের উচিত তাদের বিশেষ খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদার দিকে নজর দেওয়া।

১০.৫ রাষ্ট্রসমূহের উচিত তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করে ডব্লিউএইচও/ইউনিসেফ-এর সুপারিশ অনুযায়ী শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস উৎসাহিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া।

১০.৬ রাষ্ট্রসমূহ শিশু ও ছোট বাচ্চাদের খাবার খাওয়ানোর বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য প্রচার করতে পারে এবং শিশুদের খাবারের বিষয়ে ভুল তথ্য বা অপপ্রচার বন্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে। এইচআইভি সংক্রমণ এবং শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে রাষ্ট্রসমূহর উচিত সবশেষ নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শ এবং ডব্লিউএইচও/ ইউনিসেফ-এর নির্দেশিকাগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা।

১০.৭ রাষ্ট্রসমূহকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামোর উন্নয়নে সমান্তরাল পদক্ষেপ নিতে এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান জানানো হচ্ছে, যাতে প্রয়োজনীয় সেবা ও পণ্যগুলো জনগণের কাছে সহজলভ্য হয় এবং তারা তাদের খাওয়া খাবারের পুষ্টির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে পুষ্টিগতভাবে ভালো থাকতে পারে।

১০.৮ পরিবারের ভেতরে পুষ্টির সুষম স্তর নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের উচিত যেকোনো ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ, বিশেষ করে লিঙ্গীয় বৈষম্য দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া।

১০.৯ রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে হবে যে খাবার একজন ব্যক্তির সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ; এবং খাবার সংক্রান্ত ব্যক্তিগত চর্চা, প্রথা ও ঐতিহ্যগুলোকে গুরুত্ব দিতে রাষ্ট্রসমূহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১০.১০ বিভিন্ন সংস্কৃতির খাদ্যাভ্যাস ও খাবারের গুরুত্বের কথা রাষ্ট্রসমূহকে মনে করিয়ে দেওয়া

হচ্ছে; এবং সব সংস্কৃতিতে সমাজ ও পরিবারের ভেতরে খাবারের সঠিক বণ্টন, বিশেষ করে ছেলে ও মেয়েদের এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টির অধিকার ও চাহিদার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করার পদ্ধতি রাষ্ট্রসমূহকে তৈরি করতে হবে।

গাইডলাইন | ১১
শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি

১১.১ টেকসই উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রসমূহের উচিত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সাক্ষরতা এবং অন্যান্য দক্ষতা বৃদ্ধির মতো মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে করা বিনিয়োগে সহায়তা করা; যা কৃষি, মৎস্য, বনজ সম্পদ এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

১১.২ রাষ্ট্রসমূহের উচিত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগগুলো আরও শক্তিশালী ও বিস্তৃত করা, বিশেষ করে নারীদের এবং সমাজের অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য।

১১.৩ নতুন প্রজন্মের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং তার টেকসই ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে রাষ্ট্রসমূহের উচিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কৃষি এবং পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষাকে উৎসাহিত করা।

১১.৪ উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিগরি অনুষদগুলোতে কৃষি ও ব্যবসা সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালী করার মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহর উচিত উচ্চশিক্ষায় সহায়তা করা; পাশাপাশি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উন্নয়নশীল দেশের কৃষিবিদ, বিজ্ঞানী এবং ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

১১.৫ খাদ্য সংক্রান্ত যেসব নীতিগত সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে, সেগুলোতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং অধিকার ক্ষুণ্নকারী সিদ্ধান্তগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার সামর্থ্য বাড়াতে রাষ্ট্রসমূহর উচিত জনগণকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা।

১১.৬ যেহেতু বাসস্থানের পরিবেশ এবং খাবার তৈরির পদ্ধতির সাথে খাদ্য নিরাপদতার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, তাই রাষ্ট্রের উচিত মানুষের আবাসন ব্যবস্থা ও রান্নাবান্নার পরিবেশ উন্নত করার পদক্ষেপ নেওয়া। বিশেষ করে গ্রামীণ পরিবারগুলোতে শিক্ষা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১.৭ রাষ্ট্রসমূহের উচিত নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসহ পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকারের বিষয়টি স্কুলের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা অথবা এ সংক্রান্ত মানবাধিকার শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

১১.৮ পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকারের বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে অর্জনসহ সার্বিক মানবাধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে রাষ্ট্রসমূহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১১.৯ পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করার কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করতে হবে।

১১.১০ এই গাইডলাইন সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত আইন ও নিয়মকানুনগুলো যেন সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ সহজে জানতে পারে, রাষ্ট্রকে সেই সুযোগ তৈরি ও উন্নত করতে হবে।

১১.১১ এই গাইডলাইন বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সক্ষমতা তৈরি ও ক্ষমতায়ন করতে পারে।

গাইডলাইন | ১২
জাতীয় আর্থিক সম্পদ

১২.১ আঞ্চলিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের নিজ নিজ বাজেটে ক্ষুধা নিবারণ এবং খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১২.২ সরকারি সম্পদের ব্যবহার, বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

১২.৩ বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য পরিচালিত মৌলিক সামাজিক কর্মসূচি এবং ব্যয় বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রকে উৎসাহিত করা হচ্ছে; এই খাতের ব্যয়ের মান ও কার্যকারিতা বাড়ানোর পাশাপাশি বাজেট বরাদ্দ কমানোর হাত থেকে এই কর্মসূচিগুলোকে রক্ষা করতে হবে। রাষ্ট্রকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে যেন বাজেট কমানোর ফলে সমাজের দরিদ্রতম মানুষের পর্যাপ্ত খাবার পাওয়ার সুযোগ কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

১২.৪ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীল খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে রাষ্ট্রকে একটি সহায়ক আইনি ও অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে; সেইসাথে সামাজিক কর্মসূচিগুলোর জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাত থেকে তহবিলের নতুন ও উদ্ভাবনী উৎস খুঁজে বের করতে হবে।

১২.৫ প্রবাসীদের পরিবারগুলোর মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কৌশল গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, যাতে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের (রেমিট্যান্স) সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে এমন সব বিনিয়োগ নিশ্চিত করা যায় যা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে এবং পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

গাইডলাইন | ১৩
পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা

১৩.১ বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের অঙ্গীকারের সাথে মিল রেখে, রাষ্ট্রসমূহর উচিত খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য ম্যাপিং বা ফুড ইনসিকিউরিটি এন্ড ভালনারেবল ইনফরমেশন এন্ড ম্যাপিং (এফআইভিআইএমএস) করা, যাতে খাদ্য সংকটের ঝুঁকিতে থাকা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী ও পরিবারগুলোকে এবং তাদের এই সংকটের পেছনের কারণগুলো চিহ্নিত করা যায়। পর্যাপ্ত খাবার পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রসমূহকে এমন সব সংশোধনমূলক ব্যবস্থা খুঁজে বের করতে ও তৈরি করতে হবে যা তাৎক্ষণিকভাবে এবং পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

১৩.২ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, ঝুঁকি এবং পুষ্টির অবস্থার সুশৃঙ্খল ও আলাদা আলাদা বিশ্লেষণ করার জন্য রাষ্ট্রসমূহকে আহ্বান জানানো হচ্ছে; যেখানে কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্যের কারণে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বা ঝুঁকির প্রকোপ বাড়ছে কি না তা খতিয়ে দেখার ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে, যাতে এই ধরনের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বা অপুষ্টির মূল কারণগুলো দূর ও প্রতিরোধ করা যায়।

১৩.৩ সহায়তার সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে স্বচ্ছ ও বৈষম্যহীন যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে, যাতে প্রকৃত অভাবী কেউ বাদ না পড়ে এবং যার প্রয়োজন নেই সে যেন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়। সম্পদের অপচয় এবং দুর্নীতি রোধ করতে একটি কার্যকর জবাবদিহিতা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে পরিবার বা ব্যক্তির সম্পদ ও আয়, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার উপায়গুলোর মতো বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে।

১৩.৪ নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবারে খাবারের চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ হচ্ছে কি না – রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করতে চাইলে নারীদের মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে পারে।

গাইডলাইন | ১৪
নিরাপত্তা বেষ্টনী

১৪.১ সামর্থ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহর উচিত যারা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম, তাদের সুরক্ষার জন্য সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা এবং তা বজায় রাখা। কার্যকারিতা এবং পরিধি বিবেচনা করে রাষ্ট্রসমূহর উচিত সম্ভব হলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষের নিজস্ব সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান করা, যাতে সবার জন্য ধারাবাহিকভাবে পর্যাপ্ত খাবারের অধিকার নিশ্চিত হয়। রাষ্ট্রসমূহ চাইলে স্থানীয়ভাবে খাদ্য সংগ্রহের সুফলগুলোও বিবেচনা করতে পারে।

১৪.২ রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ খাদ্য সহায়তার জন্য স্থানীয়ভাবে খাদ্য সংগ্রহের সুফলগুলো বিবেচনা করা উচিত; এতে যেমন খাদ্য অনিরাপদ মানুষের পুষ্টির চাহিদা মিটবে, তেমনি স্থানীয় উৎপাদকদের বাণিজ্যিক স্বার্থও সুরক্ষিত হবে।

১৪.৩ সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিকল্পনা মূলত খাদ্য অনিরাপত্তার ধরণ, লক্ষ্য, বাজেট, প্রশাসনিক সক্ষমতা এবং স্থানীয় বাজার পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে; তবুও রাষ্ট্রকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে সহায়তার সুবিধা যেন প্রকৃত অভাবীদের কাছে পৌঁছায় এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেন কোনো ধরনের বৈষম্য না করা হয়।

১৪.৪ সামর্থ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহকে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে কোনো অর্থনৈতিক বা আর্থিক সিদ্ধান্তের ফলে অসহায় মানুষের বর্তমান খাদ্য গ্রহণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়লে, তার বদলে কার্যকর খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিত করা হয়। এই নিরাপত্তা বেষ্টনীগুলোকে এমন সব পরিপূরক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করতে হবে যা দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক।

১৪.৫ যেসব ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে খাবার প্রদান করা প্রয়োজন বলে মনে হবে, সেখানে খাদ্য সহায়তা যেন মানুষের পুষ্টির চাহিদা এবং তা পূরণে তাদের অক্ষমতার মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনে। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এই খাদ্য সহায়তা দিতে হবে; এবং স্থানীয় পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে সেই খাবার অবশ্যই পুষ্টিগুণসম্পন্ন ও নিরাপদ হতে হবে।

১৪.৬ নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষ যেন পর্যাপ্ত খাবার পাওয়ার সুযোগ পায় এবং তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে, সেজন্য রাষ্ট্রসমূহর উচিত খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি আরও কিছু সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা। এসব প্রয়োজনীয় সহায়ক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা প্রদান।

১৪.৭ নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিকল্পনা করার সময় রাষ্ট্রসমূহর উচিত এফএও, আইএফএডি এবং ডব্লিউএফপি-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আঞ্চলিক ও নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিবেচনায় রাখা; যারা গ্রামীণ দারিদ্র্য দূর করতে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষির উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে।

গাইডলাইন | ১৫
আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তা

১৫.১ খাদ্য সহায়তা নীতিমালা যেন সহায়তাপ্রাপ্ত দেশগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জাতীয় প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে তা দাতা দেশগুলোকে নিশ্চিত হবে; এবং তাদের খাদ্য সহায়তার বিধানগুলো যেন সঠিক চাহিদা নিরূপণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, বিশেষ করে খাদ্য

নিরাপত্তাহীন ও অসহায় গোষ্ঠীগুলোকে লক্ষ্য করে। এই প্রেক্ষাপটে, দাতা দেশগুলোর উচিত এমনভাবে সহায়তা প্রদান করা যা খাদ্যের নিরাপদতা, স্থানীয় খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত না করার গুরুত্ব এবং সহায়তাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর পুষ্টিগত ও খাদ্যাভ্যাসের চাহিদা ও সংস্কৃতির কথা বিবেচনায় রাখে। খাদ্য সহায়তার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্থান কৌশল থাকতে হবে এবং পরনির্ভরশীলতা তৈরির বিষয়টি এড়িয়ে চলতে হবে। দুর্ভিক্ষপ্রবণ দেশগুলোতে খাদ্যের চাহিদা মেটাতে এবং খাদ্য সহায়তার ওপর নির্ভরতা কমাতে দাতা দেশগুলোকে স্থানীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্যিক বাজারের ব্যবহার বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা উচিত।

১৫.২ আর্থিক মূল্যে রূপান্তরিত দ্বিপাক্ষিক খাদ্য সহায়তাসহ আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমগুলো অবশ্যই এফএও-এর উদ্বৃত্ত খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও পরামর্শমূলক বাধ্যবাধকতা নীতি, ফুড এইড কনভেনশন এবং ডব্লিউটিও কৃষি চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে; এবং স্থানীয় পরিস্থিতি, খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত খাদ্য নিরাপত্তা মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।

১৫.৩ আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে প্রয়োজনগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে রাষ্ট্র এবং সংশ্লিষ্ট অ-রাষ্ট্রীয় পক্ষসমূহের নিরাপদ ও বাধাহীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে আন্তর্জাতিক চাহিদা নিরূপণ কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তা বিতরণে নিয়োজিত মানবিক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও নিরাপদ ও অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

১৫.৪ জরুরি পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তা প্রদানের সময় সহায়তাপ্রাপ্ত দেশগুলোর দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন ও উন্নয়নের লক্ষ্যগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে এবং সর্বজনস্বীকৃত মানবিক নীতিমালাগুলোকে সম্মান করতে হবে।

১৫.৫ খাদ্য সহায়তার চাহিদা নিরূপণ এবং এর পরিকল্পনা, তদারকি ও মূল্যায়ন কার্যক্রম যতটা সম্ভব অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে হতে হবে এবং যখনই সম্ভব হয়, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সহায়তাপ্রাপ্ত সরকারের সাথে নিবিড় সহযোগিতার মাধ্যমে তা সম্পন্ন করতে হবে।

গাইডলাইন | ১৬
প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ

১৬.১ খাদ্যকে কখনোই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

১৬.২ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধীনে রাষ্ট্রসমূহ যে দায়বদ্ধতা গ্রহণ করেছে, তারা তা পুনরায় নিশ্চিত করছে; বিশেষ করে ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন এবং ১৯৭৭ সালের অ্যাডিশনাল প্রোটোকল-এর পক্ষ হিসেবে সশস্ত্র সংঘাত ও দখলদারিত্বের সময়

বেসামরিক জনগণের খাবার পাওয়ার অধিকারসহ অন্যান্য মানবিক চাহিদা পূরণের বিষয়গুলো এখানে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

> অ্যাডিশনাল প্রোটোকল ১-এ বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, "যুদ্ধের কৌশল হিসেবে বেসামরিক মানুষকে ক্ষুধার্ত রাখা নিষিদ্ধ" এবং "বেসামরিক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য জিনিসগুলো—যেমন খাদ্যদ্রব্য, খাবার উৎপাদনের কৃষিজমি, ফসল, গবাদি পশু, সুপেয় পানির ব্যবস্থা ও সরবরাহ এবং সেচ ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ করা, ধ্বংস করা, সরিয়ে ফেলা বা অকেজো করে দেওয়া নিষিদ্ধ; হোক তা তাদের খাবার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে বা বেসামরিক মানুষ বা প্রতিপক্ষকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য অথবা অন্য যেকোনো উদ্দেশ্যে; এবং এই জিনিসগুলোকে কখনোই যুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।"

১৬.৩ দখলদারিত্বের পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে বলা হয়েছে যে: দখলদার শক্তিকে তাদের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে জনগণের খাবার ও চিকিৎসাসামগ্রী নিশ্চিত করতে হবে; বিশেষ করে যদি দখলকৃত অঞ্চলের নিজস্ব সম্পদ যথেষ্ট না হয়, তবে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, চিকিৎসাসামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ে আসতে হবে; এবং যদি সেই অঞ্চলের জনগণের একটি অংশ বা পুরো অংশ পর্যাপ্ত সরবরাহ না পায়, তবে দখলদার শক্তিকে ওই জনগণের পক্ষে ত্রাণ কর্মসূচিতে রাজি হতে হবে এবং তাদের কাছে থাকা সব উপায়ে তা পৌঁছাতে সহায়তা করতে হবে।

১৬.৪ মানবিক সেবাকর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে রাষ্ট্রসমূহ তাদের বাধ্যবাধকতাগুলো পুনরায় নিশ্চিত করছে।

১৬.৫ রাষ্ট্রসমূহর উচিত শরণার্থী এবং দেশের অভ্যন্তরে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য সব সময় পর্যাপ্ত খাবার পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। দেশের অভ্যন্তরে বাস্তুচ্যুত হওয়ার পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে গাইডিং প্রিন্সিপালস অন ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১৬.৬ প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহর উচিত অভাবী মানুষকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা; যদি নিজেদের সম্পদ যথেষ্ট না হয় তবে তারা আন্তর্জাতিক সহায়তা চাইতে পারে; এবং স্থানীয় পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে আন্তর্জাতিক আইন ও সর্বজনস্বীকৃত মানবিক নীতিমালা অনুযায়ী যেন ওই সহায়তা নিরাপদ ও বাধাহীনভাবে পৌঁছাতে পারে রাষ্ট্রকে তা সহজ করে দিতে হবে।

১৬.৭ প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ প্রতিরোধ বা এর প্রভাব কমাতে রাষ্ট্রসমূহকে একটি কার্যকর ও উপযুক্ত পূর্ব সতর্কবার্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই ব্যবস্থাগুলো আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট তথ্যের মাধ্যমে তৈরি করতে হবে এবং তা নিয়মিত তদারকি করতে হবে। দুর্যোগ মোকাবিলায় রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি

নিতে হবে, যেমন খাবারের মজুদ রাখা এবং তা সঠিক সময়ে বিতরণের জন্য একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১৬.৮ প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ফলে পুষ্টির ওপর কী প্রভাব পড়ছে তা যাচাই করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো কীভাবে পরিস্থিতি সামলাচ্ছে তা বোঝার জন্য রাষ্ট্রসমূহকে একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং দুর্যোগ সহনশীলতা তৈরির কর্মসূচিগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন আরও নিখুঁত করা সম্ভব হবে।

গাইডলাইন | ১৭
তদারকি, নির্দেশক এবং মানদন্ড

১৭.১ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে এই নির্দেশিকাগুলোর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য রাষ্ট্রসমূহ নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহ তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী বর্তমান তথ্য ব্যবস্থাগুলোকে আরও শক্তিশালী করবে এবং তথ্যের যেকোনো ঘাটতি দূর করার চেষ্টা করবে।

১৭.২ দেশের অভ্যন্তরীণ নীতি, কর্মসূচি এবং প্রকল্পগুলো সাধারণ জনগণের এবং বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলোর পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকারের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, তা যাচাই করার জন্য রাষ্ট্রসমূহ ‘রাইট টু ফুড ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট’ বা খাদ্যের অধিকারের প্রভাব নিরূপণের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। এটি প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি শক্ত ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

১৭.৩ পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য রাষ্ট্রসমূহ বর্তমানে ব্যবহৃত নির্দেশক এবং এফআইভিআইএমএস (Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems)-এর মতো তদারকি ব্যবস্থাগুলোর ওপর ভিত্তি করে একগুচ্ছ কার্যক্রম, প্রভাব ও ফলাফল ভিত্তিক নির্দেশক তৈরি করতে পারে। রাষ্ট্রসমূহ স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট মাইলফলক ঠিক করতে পারে, যা দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিবারণের ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন এবং মিলেনিয়াম সামিটে গৃহীত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যগুলোর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হবে।

১৭.৪ এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম ভিত্তিক নির্দেশকগুলোকে এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত যাতে সেগুলো সরাসরি নির্দিষ্ট নীতি ও পদক্ষেপগুলোর প্রতিফলন ঘটায় এবং পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার অর্জনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এই ধরনের নির্দেশকগুলো রাষ্ট্রকে আইনি, নীতিগত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে, বৈষম্যমূলক আচরণ বা ফলাফল শনাক্ত করতে সাহায্য করবে এবং অধিকার আদায়ের প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণের মাত্রা নিশ্চিত করবে।

১৭.৫ রাষ্ট্রসমূহকে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলোর, বিশেষ করে নারী, শিশু এবং বয়স্কদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা পরিস্থিতি এবং তাদের পুষ্টির অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যার মধ্যে অণুপুষ্টির ঘাটতির হারও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১৭.৬ তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং প্রচারের এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রকে অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা নিশ্চিত করতে হবে।

গাইডলাইন | ১৮
জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান

১৮.১ যেসব রাষ্ট্র জাতীয় আইন বা নীতি হিসেবে অধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে এবং যাদের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বা ন্যায়পাল রয়েছে, তারা চাইলে তাদের কর্মপরিধিতে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার অর্জনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। যেসব রাষ্ট্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বা ন্যায়পাল নেই, তাদের সেগুলো প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। প্যারিস প্রিন্সিপলস অনুযায়ী, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত হতে হবে। পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার অর্জনের বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলো যে তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করে, সেখানে যাতে নাগরিক সমাজের সংগঠন এবং সাধারণ ব্যক্তিরা অবদান রাখতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রসমূহর উচিত তাদেরকে উৎসাহিত করা।

১৮.২ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেন নাগরিক সমাজের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলে এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করে, রাষ্ট্রসমূহকে সে বিষয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

গাইডলাইন | ১৯
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

১৯.১ ভলেন্টারি গাইডলাইন বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ, কার্যক্রম ও অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে, যা পরবর্তী তৃতীয় অংশে বর্ণিত হয়েছে। এসব উদ্যোগ রাষ্ট্রসমূহকে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকারের ধারাবাহিক বাস্তবায়নে সহায়তা করবে, এবং সহস্রাব্দ ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন ও বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন- পাঁচ বছর পর উল্লিখিত রাষ্ট্রের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার আলোকে ধারাবাহিকভাবে পর্যাপ্ত খাদ্য অধিকার অর্জনে সহায়তা করবে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং একপাক্ষিক ব্যবস্থা

১. সাম্প্রতিক প্রধান আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোর প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ক্ষুধার স্থায়িত্ব নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবিলায় জাতীয় সরকারগুলোর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার প্রস্তুতি ব্যক্ত করেছে এবং উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার অঙ্গীকার করেছে, যার মধ্যে ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জোট অন্তর্ভুক্ত।

২. রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রধানত দায়বদ্ধ, যার মধ্যে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে মানুষের জন্য ধারাবাহিকভাবে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত। জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টা একটি সহায়ক আন্তর্জাতিক পরিবেশ দ্বারা সমর্থিত হওয়া উচিত—এই বিষয়টি জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, যার মধ্যে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থাসহ জাতিসংঘের অপরাপর সংস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত, তাদের নিজ নিজ ম্যান্ডেট অনুযায়ী জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জাতিসংঘের সনদের ৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদে এবং টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের বাস্তবায়ন পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ফলাফলে স্বীকৃত হয়েছে। খাদ্যকে কখনোই অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক চাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

৩. আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন সিদ্ধান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জনগণের সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি এবং তাদের ক্রমান্বয়ে পর্যাপ্ত খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে অন্তরায় ঘটে এমন যে কোন ধরনের একপাক্ষিক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে কিংবা পরিহার করতে রাষ্ট্রসমূহর প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা

৪. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বিশেষত মন্টেরে সমঝোতা চুক্তিতে, উন্নত দেশসমূহকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করতে হবে, যার মধ্যে সহস্রাব্দ সনদে অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যসমূহও রয়েছে। রাষ্ট্রসমূহ এবং প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করবে। বাহ্যিক সহায়তা, যার মধ্যে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যেকার সহযোগিতাও অন্তর্ভুক্ত, সেটি জাতীয় নীতি ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রদান করা উচিত।

প্রযুক্তিগত সহযোগিতা

৫. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে, যাতে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিকভাবে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা যায়। এর জন্য প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সম্মত শর্তে প্রযুক্তি হস্তান্তর নিশ্চিত করতে হবে, যেমনটি প্রধান আন্তর্জাতিক সম্মেলনসমূহে অঙ্গীকার করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার প্রতিবন্ধকতা, যেমন এইচআইভি/এইডস মোকাবিলায় সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

৬. অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস এবং খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৭. রাষ্ট্রসমূহকে উন্নয়নের একটি কার্যকর উপায় হিসেবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উন্নীত করতে হবে, কারণ বর্ধিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনেক উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাসের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

৮. মনে রাখা দরকার যে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি বিষয়ক চুক্তির দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হলো একটি ন্যায্য ও বাজারমুখী বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এর জন্য মৌলিক সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে শক্তিশালী নিয়ম এবং সহায়তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে বৈশ্বিক কৃষি বাজারে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও বিকৃতি সংশোধন ও প্রতিরোধ করা যায়।

৯. রাষ্ট্রসমূহকে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনসমূহে গৃহীত অঙ্গীকারসমূহ এবং সাও পাওলো সমঝোতা (জাতিসংঘের বাণিজ্য এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলনের ১১ নং অধিবেশনে গৃহীত) চুক্তির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, যার মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত:

> ৭৫. বর্তমান আলোচনার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় কৃষি। দোহা ঘোষণায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তিনটি মূল স্তম্ভে আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করা উচিত। এগুলো হলো: বাজারে প্রবেশাধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা, সকল ধরনের রপ্তানি ভর্তুকি ধাপে ধাপে বিলুপ্তির লক্ষ্যে হ্রাস করা, এবং জাতীয় পর্যায়ে সহযোগিতার জন্য সহায়ক বাণিজ্য ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন বিষয়াবলি উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চলমান কৃষি বিষয়ক আলোচনা এমন ফলাফল প্রদান করবে যা দোহা ম্যান্ডেটের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য আলাদা ও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি সকল আলোচনার

অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নসহ তাদের উন্নয়ন চাহিদাকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া হবে। দেশগুলোর অ-বাণিজ্যিক উদ্বেগসমূহও কৃষি চুক্তির বিধান অনুযায়ী এবং দোহা মন্ত্রী পর্যায়ের ঘোষণার ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে বিবেচনা করা হবে।

৭৭. দোহা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত অ-কৃষি পণ্যের বাজার প্রবেশাধিকার স্বাধীনভাবে সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা জোরদার করা উচিত। এর লক্ষ্য হবে শুল্ক, উচ্চ শুল্কহার, শুল্ক বৃদ্ধি এবং অ-শুল্ক বাধা হ্রাস বা প্রয়োজনে বিলুপ্ত করা, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানি স্বার্থসম্পন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে। আলোচনায় উন্নয়নশীল দেশ ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিশেষ প্রয়োজন ও স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে বিবেচনায় নিতে হবে, যার মধ্যে পূর্ণমাত্রার শুল্ক হ্রাসের প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে তাদেরকে ছাড় দেয়াও অন্তর্ভুক্ত।

১০. এ ধরনের পদক্ষেপসমূহ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

বৈদেশিক ঋণ

১১. ক্ষুধা নিবারণ, গ্রাম ও শহরের দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের উচিত যথাযথভাবে, জোরালোভাবে এবং দ্রুততার সাথে বৈদেশিক ঋণ মওকুফের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয় পক্ষেরই অস্থিতিশীল ঋণ পরিস্থিতি প্রতিরোধ ও সমাধানের ক্ষেত্রে যৌথ দায়িত্ব রয়েছে। জোরদার করা 'ভয়াবহ ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশ' (HIPC) উদ্যোগের দ্রুত, কার্যকর এবং পূর্ণ বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি, যার জন্য অতিরিক্ত অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। তদুপরি, সকল সরকারি এবং বাণিজ্যিক ঋণদাতাকে এই উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। উচ্চ ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশসমূহকে HIPC উদ্যোগের পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ বা অব্যাহত রাখতে হবে।

আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা

১২. মন্টেরে সমঝোতা চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, উন্নত দেশসমূহকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করতে হবে, যার মধ্যে সহস্রাব্দ সনদে উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহও রয়েছে। এ লক্ষ্যে পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য মোট জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ০.১৫ থেকে ০.২ শতাংশ ওডিএ (Official Development Assistance) প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই সহায়তাকে আরও

কার্যকর করার জন্য এর গুণগত মান উন্নত করতে হবে, যেমন উন্নত সমন্বয়, জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযুক্তি, পূর্বানুমানযোগ্যতা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রকৃত জাতীয় মালিকানা নিশ্চিত করা। দানকারী দেশসমূহকে উৎসাহিত করা হয় যেন তারা এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যাতে ঋণমুক্তির জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য নির্ধারিত ওডিএ সম্পদকে হ্রাস না করে। উন্নয়নশীল দেশসমূহকেও উৎসাহিত করা হয়, তারা যেন ওডিএ কার্যকরভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ চালিয়ে যায়। এছাড়াও, টেকসই প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী আর্থিক ব্যবস্থাগুলো অনুসন্ধান করা উচিত।

আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তা

১৩. যেসব রাষ্ট্র খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদান করে, তাদের উচিত নিয়মিতভাবে তাদের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা, যাতে গ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের জাতীয় প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা যায়—বিশেষ করে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। খাদ্য সহায়তা নীতিমালা প্রণয়নের সময় সঠিক প্রয়োজন নিরূপণের ওপর ভিত্তি করা উচিত, যেখানে দাতা ও গ্রহীতা উভয় পক্ষের অংশগ্রহণ থাকবে এবং বিশেষভাবে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া খাদ্য সহায়তা এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে খাদ্য নিরাপত্তা, স্থানীয় ও আঞ্চলিক খাদ্য উৎপাদন সক্ষমতা ও তার সুফল, এবং গ্রহীতা জনগোষ্ঠীর পুষ্টিগত চাহিদা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়।

এনজিও/নাগরিক সংগঠন/বেসরকারি খাতের সঙ্গে অংশীদারিত্ব

১৪. রাষ্ট্রসমূহ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি খাত, সকল প্রাসঙ্গিক বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীজনকে অংশীদারিত্ব জোরদার করা এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং সক্ষমতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যার উদ্দেশ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ধাপে ধাপে বাস্তবায়নকে শক্তিশালী করা।

পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষা

১৫. মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের অঙ্গ ও বিশেষায়িত সংস্থাসমূহকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলসমূহের ধারাবাহিক ও নিরপেক্ষ প্রয়োগের ভিত্তিতে তাদের কার্যক্রমের সমন্বয় আরও জোরদার করতে হবে, যার মধ্যে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত। সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ জাতিসংঘের একটি অগ্রাধিকারমূলক লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হতে হবে, যা এর উদ্দেশ্য ও

নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। এই কাঠামোর মধ্যে, সকল মানবাধিকার (যার মধ্যে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ধাপে ধাপে বাস্তবায়নও অন্তর্ভুক্ত), উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা সকল সদস্য রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং নাগরিক সমাজের জন্য একটি বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন

১৬. রাষ্ট্রসমূহ স্বেচ্ছাসেবী ভিত্তিতে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত এই ভলান্টারি গাইডলাইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম এবং অর্জিত অগ্রগতির ওপর প্রতিবেদন প্রদান করতে পারে। এই প্রতিবেদনসমূহ এফএও-র বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কমিটিতে (সিএফএস) তাদের নির্ধারিত প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার আওতায় পেশ করতে পারে।

VOTE
VOTE

খাদ্যের অধিকার একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার, যার কার্যকর বাস্তবায়নে আইন, নীতি ও জবাবদিহিতার সমন্বিত প্রয়োগ অপরিহার্য। এই বাস্তবতায় জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক গৃহীত ভলান্টারি গাইডলাইনটি রাষ্ট্র ও অংশীজনদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত কাঠামো প্রদান করে। আইন প্রণেতা, মানবাধিকারকর্মী, উন্নয়ন সংগঠন, গবেষক এবং গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে এই আন্তর্জাতিক নির্দেশিকাকে সহজলভ্য ও ব্যবহারযোগ্য করে তুলতেই বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক (খানি বাংলাদেশ) বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করেছে। এই প্রকাশনা নীতি প্রণয়ন, আইন সংস্কার, গবেষণা, অ্যাডভোকেসি এবং জনস্বার্থে জবাবদিহিতাভিত্তিক উদ্যোগে একটি নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

Brot für die Welt

KHANI খানি
FOOD SECURITY NETWORK
BANGLADESH

praan